মার্গারেট মিড : নৃতত্ত্বের রানী

ফরিদ আহমেদ

মার্গারেট মিড (Margaret Mead) ছিলেন বিশ্বখ্যাত আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ, বুদ্ধিজীবি এবং সমাজ বিজ্ঞানী। সামাজিক বিজ্ঞানের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম প্রভাবশালী নারী চিন্তাবিদ তিনি। যে ক'জন সামান্য সংখ্যক ক্ষণজন্মা নারী যুগে যুগে তাদের অসামান্য প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতার গুনে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দুনিয়া কাঁপিয়েছেন, মিড ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। আদিম সমাজ গবেষনার পথিকৃত মার্গারেট মিড, এ ধরনের সমাজ নিয়ে রচনা করেছেন অসংখ্য গ্রন্থ ও গবেষণা পত্র। শুধু আদিম সমাজই নয়, সমকালীন বিষয় নিয়েও ব্যাপক লেখালেখি করেছেন তিনি। সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, পরিবেশবিদ্যা, নারী আন্দোলন, ছাত্র রাজনীতি সহ অসংখ্য বিষয়ে তার বিচরণ ছিল সহজ এবং সাবলীল। দুনিয়াজুড়ে বহু ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে তার লেখনি। কয়েক প্রজন্মের আমেরিকানদের মিড শিখিয়েছেন কিভাবে মুক্তমন নিয়ে পৃথিবীতে বিরাজমান অন্যান্য সংস্কৃতি বিশেষ করে আদিম সংস্কৃতিকে বুঝতে হয়। নৃতত্ত্বের গুরুগম্ভীর বিষয়গুলোকে অতি সহজভাবে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন তিনি । নৃতত্ত্বকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তার অবদান তুলনাহীন।

ছোটোখাটো গড়নের মিড ছিলেন অকুতোভয় তরুনী। ১৯২৫ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে বিবাহিত মিড একাকী প্রায় অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ স্যামোয়া (Samoa) তে যান তার গবেষণার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জন্য এটা হয়তো তেমন কিছুই না। কিন্তু বিশের দশকে এটি ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। সেই সময়ে বিবাহিত

মেয়েদের স্বামী, ঘর সংসার এবং বাচ্চা-কাচ্চার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করাটাই ছিল সামাজিক প্রতাশ্যা। দুঃসাহসী এবং সময়ের চেয়ে অগ্রগামী মার্গারেট মিড প্রচলিত সামাজের সমস্ত বৈষম্যমূলক রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করে একাই যাত্রা করেন স্যামোয়ার পথে। Andrew Whiteford মিডকে বর্ণনা করেছেন এভাবে "Maggie was a short little lady with immense courage-a first of a kind-took nothing for granted and wrote copiously of her field experience. She could be disarmingly friendly one minute and put you in your place the next"

স্যামোয়ায় একাকী গবেষণার ফলাফল হিসাবে পলিনেশীয় (Polinesia) একটি সমাজের adolescent behaviour এর উপর ১৯২৮ সালে মিড প্রকাশ করেন তার অসম্ভব জনপ্রিয় গ্রন্থ "Coming of Age in Samoa." প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই এটি পরিনত হয় বেস্ট সেলারে । সেইসাথে মিড চলে আসেন নৃতত্ত্বের সামনের সারিতে। তারপর থেকে মিডকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হয় তার একই ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ "Growing Up in New Gunea" এবং ট্রিলজীর সর্বশেষ গ্রন্থ "Sex and Temperment in Three Primitive Societies." এই গ্রন্থগুলি কেতাবি কাজ হিসাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং উচ্চমানের নিঃসন্দেহে কিন্তু সারাজীবন মিড যা করেছেন বস্তুত তার সামান্যই প্রতিনিধিত্ব করে এগুলো। নিরলসভাবে মিড লিখে গেছেন সমাজে নারীর ভূমিকা, শিশু প্রতিপালনসহ অসংখ্য বিষয়ের উপর যা আদিম সমাজের লৈঙ্গিক ভূমিকা (Sex role) এবং আমেরিকান সমাজের বিভিন্ন দিককে সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "Male and Female," "Balinese Character: A Photo Analysis," "Cooperation and Competition Among Primitive Peoples," "Continuities in Cultural Evolution," and "New Life for Old."

মিড বারনার্ড কলেজে (Barnard College) থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পি এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৬ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি কাজ করেছেন নিউইয়র্কের আমেরিকান মিউজিক অফ ন্যাচারাল হিষ্ট্রির নৃতত্ত্ব বিভাগে। প্রথমে সহকারী কিউরেটর হিসাবে, পরবর্তীতে সহযোগী কিউরেটর এবং সবশেষে কিউরেটর হিসাবে। ১৯৬৯ সালে তিনি নিউইয়র্কের লিংকন সেন্টারে অবস্থিত ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ লিবারেল আর্টসের সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। একই বছর টাইম ম্যাগ্যাজিন মিডকে 'Mother of the Year' উপাধিতে ভূষিত করে। মিড অসংখ্য সরকারী ও আন্তর্জাতিক কমিশনের হয়ে কাজ করেছেন এবং আধুনিক সামাজিক সমস্যার একজন বিতর্কিত বক্তা ছিলেন। তিনি আমেরিকান এনথ্রোপোলোজিকাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডন্ট

ছিলেন। প্রথম মহিলা নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডভানসমেন্ট সায়েন্সেরও প্রেসিডেন্টেরও দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন। আটাশটি সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত ছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালে মার্গারেট মিড মরণোত্তর 'প্রেসিডেন্টশিয়াল মেডাল অফ ফ্রিডমে' ভূষিত হন।

মার্গারেট মিড ১৯০১ সালে ফিলাডেলফিয়ার এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার বাবা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ পেনস্যালভিয়ানের অর্থনীতির প্রফেসর। মিডের মা-ও ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। তিনি ছিলেন অভিবাসী, কালো আমেরিকান এবং নারীদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বাবা-মায়ের অনবরত স্থান পরিবর্তন করার কারণে মিডের ছেলেবেলা কেটেছে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে। এর ফলে মিডের জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সম্মৃদ্ধ, যা পরবর্তিতে মিডকে সাহায্য করেছে তার পেশা বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে। বাবা-মা দুজনই শিক্ষিত এবং সমাজ সচেতন হওয়ার কারণে সেই সময়কার সামাজিক পরিবেশের চেয়ে ভিন্নতর পরিবেশ পেয়েছিলেন মিড। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা আশা করতো নারী হবে ঘরমুখো। সন্তান জন্মদান, তাদের প্রতিপালন এবং স্বামীর মনোরঞ্জনই হবে মেয়েদের একমাত্র করণীয় কাজ। সৌভাগ্যক্রমে মিড পেয়েছিলেন এমন এক পরিবেশ যেখানে বিশ্বাস করা হতো যে নারীরাও বেছে নিতে পারে তাদের নিজস্ব পেশা ।

১৯১৯ সালে মিড ভর্তি হন ডিপও কলেজে (DePauw College). কিন্তু পরবর্তিতে বদলি হয়ে চলে যান নিউইয়র্কের বারনার্ড কলেজে (Barnard College). পড়াশুনা চলাকালীন সময়েই মার্গারেট বিয়ে করেন প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র লুথার ক্রেসম্যানকে। বারনার্ড কলেজেই মিড সংস্পর্শে আসেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ফ্রাঞ্জ বোয়ার (Franz Boas) । বোয়া তখন বারনার্ড কলেজে নৃতত্ত্ব পড়াতেন। মিড নৃতত্ত্বের কোর্সটি নেন এবং এই কোর্সের মাঠ পর্যায়ের গবেষণার জন্য স্যামোয়া যাওয়ার বায়না ধরেন।

বোয়া তার এই প্রানোচ্ছল এবং নিষ্ঠাবতী ছাত্রীটিকে খুবই পছন্দ করতেন। তার মনে হয়েছিল, স্বনামে বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ মার্গারেটের প্রাপ্য। কাজেই তিনি তার প্রিয় ছাত্রীকে সেই সময়কার সবচেয়ে আলচিত বিষয় টিন এজারদের আচরণ (টিন এজার শব্দটি অবশ্য বিশের দশকে প্রচলিত ছিলনা) নিয়ে গবেষনা করতে বলেন। কিন্তু মার্গারেটেরে চিন্তা ছিল ভিন্ন। তার ইচ্ছা ছিল সভ্যতা কিভাবে সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনে তা নিয়ে গবেষনা করার। বোয়া তাকে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের নিয়ে গবেষনা করতে বলেন। কিন্তু মার্গারেটের যুক্তি ছিল আমেরিকানদের সংস্পর্শে এসে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা আদিম সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে। তার মতে সত্যিকারের আদিম সংস্কৃতি পেতে হলে যেতে হবে সভ্যতার থেকে অনেক দূরে, পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সভ্যতার ঢেউ

আছড়ে পড়েনি এখনো। আর এর জন্য তার আগ্রহ ছিল পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের টুয়ামটো (Tuamoto) দ্বীপে গিয়ে গবেষনা করা।

মার্গারেটের ইচ্ছার কথা শুনে বোয়ার মাথায় বাজ পড়ার দশা। কিভাবে তিনি বিবাহিত স্বল্পবয়সী একাকী একটি মেয়েকে অনুমতি দেবেন অর্ধ পৃথিবী পাড়ি দিয়ে সভ্যতার আলোক বঞ্চিত পলিনেশীয় দ্বীপে যেতে। অজানা কোন ভয়ংকর বিপদ বা মারাত্মক কোন অসুখের কবলে পড়ার সম্ভাবনা যেখানে প্রতি পদে পদে। সেই সময় প্রচলিত ধারণা ছিল যে, পলিনেশীয় অঞ্চলে মানুষখেকো মানুষের বসবাস রয়েছে। এর মধ্যে আবার টুয়ামটো দ্বীপ পলিনেশীয়ার সর্বশেষ প্রান্ত ফ্রেঞ্চ পলিনেশীয়ায় অবস্থিত। বাকী বিশ্বের সঙ্গে এই দ্বীপের যোগাযোগ একেবারে নেই বললেই চলে।

অনেক টানা হেচড়ার পর অবশেষে বোয়া এবং মিড একটি সমঝোতায় পৌঁছান। মিড প্রস্তাব করেন যদি বোয়া তাকে দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরে কাজ করার অনুমতি দেন তাহলে সে তার নিজস্ব পছন্দনীয় বিষয় বাদ দিয়ে বোয়ার পছন্দের বিষয় adolescent behaviour নিয়ে কাজ করবে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে।

ব্যাপক অনুসন্ধানের পর অবশেষে পলিনেশীয়ায় মার্গারেটের জন্য সুবিধাজনক একটি গবেষনা ক্ষেত্র খুঁজে বের করা হল।

নিরক্ষীয় রেখা থেকে এক হাজার মাইল দক্ষিনে অবস্থিত দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ স্যামোয়াকে বেছে নেওয়া হলো মার্গারেটের গবেষনার ক্ষেত্র হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে স্যামোয়া দ্বীপপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে বাষ্পচালিত জাহাজের জ্বালানী ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ কেন্দ্র ছিল স্যামোয়া। ১৯২৫ সালের দিকে স্যামোয়া দ্বীপপুঞ্জ দুই অংশে বিভক্ত ছিল- পশ্চিম স্যামোয়া, বর্তমানে যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, সেই সময় নিউজিল্যান্ডের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে ছিল। অন্যদিকে, পূর্বাঞ্চলীয় অর্ধাংশ বা আমেরিকান স্যামোয়া সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ। টুটুইলা (Tutuila) দ্বীপের প্যাগো প্যাগোতে (Pago Pago) ইউএস নেভির বিশাল এক নৌ ঘাটি ছিল। নৌ ঘাটিতে সেনাদের জন্য একটি হসপিটাল এবং রেডিও স্টেশনও ছিল।

ইউএস নেভির এই ঘাটিই মূলতঃ বোয়ার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল। বোয়ার ধারণা ছিল, যদি মার্গারেট কোন সমস্যায় পড়ে সেক্ষেত্রে সে নেভির শরনাপন্ন হতে পারবে। এছাড়া প্যাগো প্যাগো থেকে প্রতি তিন সপ্তাহ পর পর যাত্রীবাহী জাহাজ আমেরিকার মূল ভূখন্ডে যাতায়াত করতো। অধিকন্তু, নেভির রেডিও ব্যবহার করে আমেরিকান বেসামরিক নাগরিকরা বার্তা প্রেরণ বা বার্তা গ্রহণ করতে পারতো।

১৯২৫ সালের অগাষ্ট মাসের ৩১ তারিখে দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে এস এস সনোমাতে (SS Sonoma) চড়ে হাওয়াই থেকে তিন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মার্গারেট এসে পৌঁছালেন স্যামোয়ার প্যাগো প্যাগোতে।

বর্তমান সময়ে সাধারণত এই ধরনের গবেষনা দলবদ্ধভাবে করা হয়ে থাকে, যেখানে থাকে বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞরা। তারা সাথে নিয়ে যান প্রচুর সংখ্যক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জরুরী ঔষধপত্র, গবেষনার নমুনা সংরক্ষনের সুব্যবস্থা, পরিমাপক যন্ত্র, টাইপ রাইটার বা কম্পিউটার, টেপ রেকর্ডার, ফিল্ম, ভিডিও বা স্টিল ক্যামেরা এবং নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা।

পক্ষান্তরে, মার্গারেটের উপকরণ ছিল খুবই সামান্য। ব্যক্তিগত জিনিস পত্রের বাইরে তার সম্বল ছিল কয়েকটি পেনসিল, নোটবুক, একটি স্টিল ক্যামেরা এবং একজোড়া অতিরিক্ত চশমা। নিঃসঙ্গ মার্গারেটের পক্ষে কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বোয়ার সাথে চিঠিপত্র ছাড়া আর অন্য কোনভাবেই তার গবেষনা নিয়ে আলোচনা বা পরামর্শ করার কোন সুযোগই ছিল না।

তৎকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষনায় নিয়োজিত গবেষকদের গবেষনার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলনা। সেইসময় কারোরই চিন্তা ছিলনা মাঠ পর্যায়ের গবেষনার সময় গবেষক তার দুঃসহ একাকীত্বকে কিভাবে সামলাবেন অথবা অজানা কোন বিপদকে কিভাবে মোকাবেলা করবেন। এ যেন কাউকে গভীর সমুদ্রে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করা যে, সে সাতার জানে কিনা। মিড তার এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "Many who are now professors teach their students as their professors taught them, and if young fildworkers do not give up in despair, go mad, ruin their health or die, they do, after a fashion, become anthropologists. But it is a wasteful system, a system I have no time for."

প্যাগো প্যাগোতে পৌছানোর পর পরই মিড পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েন। প্যাগো প্যাগো আমেরিকান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আর যুদ্ধবিমান দিয়ে পরিপুর্ণ কোলাহলময় এক বন্দর। মিড সুগভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেন যে, আমেরিকান নৌবাহিনী আমেরিকান সংস্কৃতি আর মূল্যবোধকে চাপিয়ে দিয়েছে নিরীহ স্যামোয়ানদের উপর। প্যাগো প্যাগোতে স্যামোয়ান মহিলারা ঐতিহ্যবাহী পোষাকের পরিবর্তে আমেরিকান পোষাক পরে চলাফেরা করছে। স্যামোয়ানদের উপর তার নিজ দেশের সংস্কৃতির এই অনাকাংখিত প্রভাব দেখে গভীরভাবে লজ্জিত হন মিড।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে মিড টুটুইলার অধিকাংশ গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং দেখতে পান যে, প্রতিটি গ্রামই ব্যাপকভাবে আমেরিকান পন্য এবং আমেরিকান কৃষ্টি দ্বারা

প্রভাবিত। কোন গ্রামই সামোয়ানদের আদি এবং অকৃত্রিম সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে না। সর্বোপরি, কোন গ্রামেই তার গবেষনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রয়োজনীয় তরুনী নেই।

এই সমস্ত বাস্তব অসুবিধার কথা চিন্তা করেই মিড টুটুইলা থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরের মানু (Manu) দ্বীপমালার ক্ষুদ্র দ্বীপ টাউতে (Ta'u) যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানকার একমাত্র শেতাঙ্গ পরিবার মার্কিন নৌ সদস্য এডওয়ার্ড হোলটের বাড়ীর বাড়তি একটি কামরা ছেড়ে দেওয়া হয় মিডের জন্য।

টাউতে আসার পরই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন মিড। তিনি তার গবেষনার জন্য ঠিক যে ধরনের সমাজ খুজছিলেন টাউ তার আদর্শ রূপ। টাউ সংস্কৃতি তার কাছে স্যামোয়ার যে কোন অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী আদিম এবং অকৃত্রিম মনে হয়।

স্যামোয়ানদের মধ্যে বসবাসের সুযোগে মিড তাদের আচরন, প্রথা এবং সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষনের সুযোগ পান। তার এই পর্যবেক্ষণ প্রচলিত পশ্চিমা সমাজের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। যেমন, তিনি আবিষ্কার করেন যে, একগামিতা এবং যৌন ঈর্ষাপরায়নতার কোন স্থানই নেই স্যামোয়ানদের সমাজে। পুর্ণবয়স্ক নারী পুরুষদের মধ্যে সম্পর্ক অতি সহজেই এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। মিড এই সিদ্বান্তে উপনিত হন যে, যৌবনারম্ভে যৌনতাকে অস্বীকার করে এবং গোপন রাখার মাধ্যমে আমাদের সমাজ মূলত সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

স্যামোয়াতে তিনি আমেরিকান তরুনীদের প্রেক্ষাপটে মানু তরুনীদের যৌন আচরনের তুলনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, বংশগতি নয় বরং সংস্কৃতিই ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। এই গবেষণার ফলাফল হিসাবে আবির্ভূত হয় তার পাঠক নন্দিত গ্রন্থ Coming of Age in Samoa। স্যামোয়া থেকে ফিরে আসার পথে মিড পরিচিত হন নৃতত্ত্ববিদ রিও ফরচুনের সাথে। পরবর্তীতে তিনি তার স্বামী লুথারের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং রিও-র সঙ্গে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৩১ সালে মার্গারেট প্রথমত আরাপেশ (Arapesh) এবং পরবর্তীতে মুনদুগুমর (Mundugumor) ও চাম্বুলিদের (Tchambuli) উপর গবেষনা করার জন্য নিউ গিনিতে (New Guinea) যান। এখানে তার গবেষনার বিষয় ছিল সংস্কৃতিতে লৈঙ্গিক ভূমিকা (Sex role) পর্যবেক্ষন করা। মিড দেখতে পান যে, আরাপেশ সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার বিদ্যমান। সমাজ ব্যবস্থা খুবই সরল ধরনের এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সন্তান লালন পালনে সমান ভূমিকা পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে, মুনদুগুমর সমাজ খুবই হিংস্র প্রকৃতির। নারী পুরুষ উভয়ই সংকীর্ণ মনা এবং আক্রমনাত্মক। কোন পক্ষই প্রকৃতপক্ষে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে চায়না। এদের সন্তানেরা সাধারণত আল্লাহ রস্তে মানুষ হয়ে থাকে। অন্যদিকে মিড চাম্বুলি সমাজে বিপরীত লৈঙ্গিক ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেন। এই সমাজের মহিলারা

পুরুষদের তুলনায় শক্তিশালী, চটপটে এবং কর্মদক্ষ। অর্থনৈতিক বা বহির্কর্মকান্ডে মূলত মেয়েরাই জড়িত। পুরুষদের দায়িত্ব হচ্ছে ঘরকন্না ও বাচ্চা-কাচ্চা সামলানো। ভিন্নমুখী এই তিন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি রচনা করেন তার গ্রন্থ Sex and Temperment in Three Primitive Societies. মার্গারেট আরো একটি গবেষনার তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্দোনেশিয়ার বালি (Bali) দ্বীপে যান, যেখানকার সন্স্কৃতি আরো বেশী বৈচিত্র্যময়। বালি দ্বীপের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেন Balinese Character: A Photo Analysis গ্রন্থটি। বালিতে থাকার সময়েই তিনি ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ গ্রেগরী বেটসন এর সংস্পর্শে আসেন এবং তার প্রেমে পড়েন। ফলাফল, রিও-র সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং গ্রেগরীকে তৃতীয় স্বামী হিসাবে বরণ।

দুঃসাহসিক এবং অপ্রচলিত ধারার নৃতাত্ত্বিক কাজ আমেরিকান সমাজে মিডকে সেলিব্রিট্রির আসনে বসিয়েছিল। মিড তার অবদানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন সাধারণ আমেরিকানদের উপর। তবে মিডের সবচেয়ে ব্যাপক এবং সুদূর প্রয়াসী প্রভাব হচ্ছে আমেরিকান সমাজে পারিবারিক ইস্যুতে কাউনসেলর হিসাবে কাজ করা। দীর্ঘ সতের বছর ধরে Redwood ম্যাগাজিনে পারিবারিক যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন তিনি। যৌথ পরিবারের ক্ষয়িষ্ণুতা, শহরে বসবাসের ফলে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা, জেনারেশন গ্যাপ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তার উদ্বেগ ছিল লক্ষ্যনীয়।

মিড ছিলেন প্রারম্ভিক নারীবাদীদের মধ্যে অন্যতম। যদিও বর্তমান নারীবাদের সাথে তার মতানৈক্য সুস্পষ্ট। বিয়ের পর তিনি স্বামীর নাম গ্রহন না করে তার কুমারী নাম বহাল রেখে তৎকালীন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তোলেন। নারী স্বাধীনতার বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর হওয়া স্বত্ত্বেও মিড মনে করতেন যে, বর্তমান সময়ের নারীবাদ অনেক বেশি নর বিদ্বেষী। পুরুষ বিদ্বেষী পুর্ব ধারণা (Prejudice) ব্যতিরেকে তিনি সমাজে লৈঙ্গিক ভূমিকা পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন।

যদিও মিড ছিলেন উচ্চ প্রশংসিত এবং আলোচিত ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না তিনি। YMCA এর বোর্ড অফ ডিরেকটরে থাকার সময় তার কিছু সহকর্মী Coming of Age in Samoa কে পর্নো বই হিসাবে আখ্যায়িত করেন। মারিজুয়ানা বিতর্কে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর তাকে 'নোংরা বুড়ী' বলে গালমন্দ করেন। এছাড়া এটর্নি জেনারেলের স্ত্রী আড়ালে তাকে 'পেত্নী' বলে ডাকতেন। তবে এগুলোর বাইরে সত্যিকার অর্থে তিনি কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন নিউজিল্যান্ড বংশোদ্ভুত অস্ট্রেলিয়ান নৃতত্ত্ববিদ ডেরেক ফ্রিম্যান এর কাছ থেকে। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির শিক্ষক ফ্রিম্যান প্রথম দিকে মিডের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি হয়ে উঠেন মিডের সবচেয়ে বড় সমালোচক। চল্লিশের দশকে ফ্রিম্যানও পশ্চিম স্যামোয়াতে গবেষনা করতে যান যদিও তার গবেষনার বিষয় ছিল ভিন্ন। স্যামোয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফ্রিম্যান মিডকে অপর্যাপ্ত এবং অসন্তোষজনক মাঠ গবেষনার দায়ে অভিযুক্ত করেন।

তিনি বলেন, মিড খুবই সামান্য সময় স্যামোয়াতে কাটিয়েছেন এবং তিনি স্যামোয়ান ভাষাও খুব ভালভাবে জানতেন না। ফলে ফ্রিম্যানের ধারণা বুদ্ধিমতি কিন্তু স্বল্পবয়সী অনভিজ্ঞ মিডকে স্যামোয়ান মেয়েরা খুব সহজেই প্রতারিত করতে পেরেছিল। স্যামোয়ানরা গবেষক যা শুনতে চায় তা বলার ব্যাপারে মহা পারদর্শী। গবেষনার সময় এডওয়ার্ড হোলটের বাড়ীতে থেকে মিড কাপুরুষতারও পরিচয় দিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে, মিডকে তার প্রথম মাঠ গবেষনার জন্য ফ্রাঞ্জ বোয়া সঠিকভাবে প্রস্তুত করায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যেহেতু মিডের পর্যবেক্ষণ বোয়ার অনুমিতির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল সেইজন্য তিনি কোন রকম সমালোচনামূলক পুনর্নিরীক্ষন ছাড়াই Coming of Age in Samoa প্রকাশিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মিডের দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী স্যামোয়া হচ্ছে স্বর্গের প্রতিরূপ। বয়স্ক এবং টিন এজারদের মধ্যে নেই কোন দ্বন্দ, নেই কোন অনুশোচনা বা আত্মহত্যা। হিংসা এবং সহিংসতা পুরোপুরি অনুপস্থিত এই সমাজে। যৌনতার ক্ষেত্রে তাদের আচরন সহজ, সরল এবং আনন্দময়। পক্ষান্তরে, ফ্রিম্যানের স্যামোয়া পুরোপুরি বিপরিত চিত্রের । অপরাধবোধ ও অনুশোচনা, টিন এজ আত্মহত্যা এবং সহিংস অপরাধে সমাজ পরিপুর্ণ। যৌনতার ক্ষেত্রে দখলিসত্ত্ব এবং ঈর্ষাপরায়নতা এই সমাজে যে কোন পশ্চিমা সমাজের মতোই দৃশ্যমান।

সত্তুরের দশকে মিড যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় কিছু সংখ্যক স্যামোয়ান ছাত্রের মুখোমুখি হন যারা তাকে তার স্যামোয়া গ্রন্থটি পরিমার্জন এবং সংশোধন করতে চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু দৃঢ়চেতা মিড তা করতে অস্বীকৃতি জানান। বইটির নতুন সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন "Coming of Age in Samoa was true convey of what I saw in Samoa and what I was able to convey of what I saw, true to the state of our knowledge of human behaviour as it was in the mid-1920s."

ফ্রিম্যানের অভিযোগের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ রুখে দাড়ান। তাদের বক্তব্য ছিল, মিডকে আক্রমনের মধ্য দিয়ে ফ্রিম্যান মিডের শিক্ষক এবং পরামর্শক ফ্রাঞ্জ বোয়াকেও আক্রমন করেছেন। এবং এর মাধ্যমে ফ্রিম্যান মূলত গোটা আমেরিকান নৃতত্ত্বকেই অপমান করেছেন।

কে সঠিক, মিড নাকি ফ্রিম্যান এর সমাধান হয়ত কোনদিনই হবে না। আজ এতো বছর পর আর হয়তো কোনভাবেই জানা সম্ভব নয় মিডের পর্যবেক্ষণ আসলেই কতোখানি সঠিক ছিল। বর্তমানকালে অনেক নৃতত্ত্ববিদই মোটামুটি একমত যে, স্যামোয়ার ব্যাপারে মিডের বর্ণনা খুবই সরল ধরনের। তিনি হয়তো সম্পূর্ণ সত্যিকে দেখতে পাননি, তবে এটাও ঠিক পুরোপুরি ভুলও দেখেননি। অনেক নৃতত্ত্ববিদের মতে, ফ্রিম্যানের কাজ মিডের চেয়েও আরো সরলীকরণ।

বর্ণময় এক জীবন শেষে ১৯৭৮ সালে ক্যান্সারে মারা যান সদা কর্মব্যস্ত সফল এই নারী। একবার এক পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে মিড বলেছিলেন, যদি তিনি আবার সুযোগ পেতেন তার জীবন গঠনের তাহলে, তিনি খুব সামান্যই পরিবর্তন করতে চাইতেন তার জীবন । তিনি যা তাই হতে চাইতেন আবার। এ থেকেই বোঝা যায় কতোখানি পরিতৃপ্ত ছিলেন তিনি তার জীবন নিয়ে।

সময়ই বর্তমান সমাজে মার্গারেট মিডের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন ইস্যুতে তার হিমালয়সম অবদানই তাকে নৃতত্ত্ব তথা মানব ইতিহাসে সুনিশ্চিত জায়গা করে দিয়েছ। এখনো পর্যন্ত নৃতত্ত্বের অবিসংবাদী রানী হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছেন।

Bibliography:

1. Cassidy, Robert. *Margaret Mead: A Voice for the Century*. New York: Universe Books, 1982.
2. Castiglia, Julie. *Margaret Mead*. Englewood Cliffs, New Jersey: Silver Burdett Press, 1989.
3. Freeman, Derek. *Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth*. Cambridge, Mass., and London, England: Harvard University press, 1983.
4. Mead, Margaret. *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilizati*on. New York: William Morrow, 1928.
5. Mead, Margaret. *Growing Up in New Guinea*. New York: William Morrow, 1953. (Originally published in 1930)
6. Mead, Margaret. *Sex and Temperament in Three Primitive Societ*ies. New York: William Morrow, 1963. (Originally published in 1935)
7. Mead, Margaret. *Some Personal Views*. Edited by Rhoda Metraux. New York: Walker & Co., 1979.
8. Pollard, Michael. *Margaret Mead*. Toronto: Irwin Publishing, 1992.

উইন্ডজর, অন্টারিও
farid300@gmail.com